Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 54-68
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যিক প্রসঙ্গ অনুসন্ধান

সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়, গলসী, পূর্ব বর্ধমান

Abstract

The Bengali culture bears a rich tradition of cultural heritage from Mediaval era to contemporary era of Twenty first century. In the early Twenty first century as one of the important and popular product of this rich cultural heritage is ‘Dhanapatir Sinhalyatra’ (2010), a famous novel authored by Ramgopal Mukhopadhyay. Kavi Kankan Mukunda wrote the famous poem ‘Chandimangal’ in the Sixteenth century. In ‘Dhanapatir Sinhalayatra’ the novelist Ramkumar Mukhopadhyay has illustrated the socio – cultural aspects in the ‘Banik Khanda’ very aptly. This novel which awarded the prestigious ‘Ananda Award’ has explained the nature of trade and contemporary social and cultural aspects in a new and unique way. The author has depicted the rich culture from sixteenth century to the contemporary twenty first century in the light of ‘Mangala Kabya’. In other words, his novel has represents the Mangala Kabya in a new way in the twenty first century. The novelist Ramkumar Mukhopadhyay has represented the rituals, culture, conventions, and life – style. The rituals of worshipping the almighty God Goddess with fruits and floer as practiced in the mediaval era in the novel. Terms like ‘Sarpi ‘i.e, Ghee and ‘Palakari ‘that denotes ‘Patal ‘can also be seen here. Simultaneously, the novelist also mentioned the name of ‘Saptadinga ‘and various impediments of trade and business in this novel. In short, it may be argued that the novelist has represented a passed culture, society and era in a new way in the post – colonial era. The return of Dhanapati to Ujjayani from Gour and the Sinhalyatra are explored by the author very aptly. This novel is the representation of society, culture and literature of the twenty first Century and is a unique contribution to the Bengali Literature that claims uniqueness of its own.

Key Words: Twenty first century, representation, socio- cultural heritage, cultural tradition, trade, society, post-colonial society.

সংস্কৃতি শব্দটির ব্যাপকতা বহুধাবিস্তৃত। এর অর্থ যুগে যুগান্তরে হয়েছে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। সাহিত্যক্ষেত্র যে এর ব্যাতিক্রম নয় সেকথা সুধীসমাজে সুপরিচিত। বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতি রত্নদীপের মতো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে অনেকক্ষেত্রে। বহু যুগের পরম্পরা বাহিত সংস্কৃতি সাহিত্যের বৃন্তে প্রস্ফুটিত শতদলের মতোই শোভিত। যে কোনো সভ্যতা, সমাজের সংস্কৃতি বাহিত হয় সাহিত্যের মধ্যে। রন্ধন, খাদ্যাভ্যাস, যানবাহন, দেশিয় লোকাচারের মতো বিষয়গুলি সাহিত্যিক আখ্যানের মধ্যে স্থান পায়। তার ব্যতিক্রম নয় ঈশ্বর বন্দনা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, অভিনেয় শিল্প প্রভৃতি।

এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-

'সভ্যতাতরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি' এই শব্দটি ভারতে প্রযুক্ত হইত- ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আমরা এই 'সংস্কৃতি' শব্দ পাই- যার দ্বারা কোনও বস্তু সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত বা উন্নত হয় তাহা-ই 'সংস্কৃতি'।[১]

এ থেকে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, ভারতীয় তথা বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন উজ্জ্বল দিক ধরা পড়েছে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' (২০১০) উপন্যাসে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধনপতি উপাখ্যান এ উপন্যাসের উপজীব্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' অনুসরণে উপন্যাসে উঠে এসেছে আঙ্গিকের অভিনবত্ব। উপন্যাসের সূচনায় আছে মাইকেল মধুসূদনের কবিকঙ্কণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ রচিত সনেটের অংশবিশেষ। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ আছে ৮ টি পালা বিভাজন। উপন্যাসের ৪৯-টি অধ্যায় বিষয়ভিত্তিক নামকরণে চিহ্নায়িত; যেমন 'রাজসমীপে ধনপতি', 'খুল্লনার আতঙ্ক, লহনার আনন্দ'।

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রসঙ্গে বলেছিলেন- '...মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষচরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধস্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি'।[২]

নিশ্চিত অর্থে একালের ঔপন্যাসিক কবিকঙ্কণের রচনায় খুঁজে পান বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত প্রভূত উপাদান। অনিবার্যভাবে 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' সাম্প্রতিক সময়ে বাঙালি সংস্কৃতির হারিয়ে যাওয়া যুগকে তুলে ধরে পাঠকের সামনে। বিস্মৃত এক সময়ের আখ্যান আকৃষ্ট করে এযুগের ঔপন্যাসিককে। তারই ফলশ্রুতি এ উপন্যাস।

ভাগ্যবিড়ম্বিত, তেজস্বী, একনিষ্ঠ ধনপতির পুরুষকার কোথাও যেন একাকার হয়ে যায় এই উত্তাল সময়ের বাসিন্দাদের মধ্যে। সংস্কৃতির রূপান্তরে মানুষের চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সুমেরু পর্বতের ওপরে দেবী চণ্ডীর সখীসঙ্গে ক্রীড়ার স্থান। উপন্যাসের সূচনায় লেখক দেখিয়েছেন সেই স্থানে ক্রীড়ারত অবস্থায় চণ্ডীর স্মরণে এসেছে খুল্লনার কথা।

উপন্যাসের আখ্যানপটে ধনপতির গৌড়দেশ যাত্রার বিবরণ নেই। সরাসরি এসেছে তার সিংহলযাত্রার প্রসঙ্গ। অর্থাৎ উপন্যাসের নামকরণের তা পয© এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁর অনুরোধ মানতে বাধ্য হয় ধনপতি। কিংবদন্তীর মাধ্যমে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। উপন্যাসের প্রথমে তিনি দেখিয়েছেন ধনপতি সিংহল যেতে অনিচ্ছুক। কিন্তু রাজভাণ্ডারের জন্য চন্দনকাঠ,চামর,লবঙ্গ, সৈন্ধব লবণ,মণিরত্ন ইত্যাদি আনতে তাকে রাজনিদে©শে যেতে হবে সিংহলদেশ। গৃহের সতিনসমস্যার ঘটনা জানিয়েও নিস্তার নেই বণিকের। বাঙালি সংস্কৃতির এই দিকটি পরিস্ফুট হয় যে, না চাইলেও বা অগাধ বিত্তশালী হলেও রাজাজ্ঞাই সেকালের মানুষের নিয়তি ও নিয়ন্ত্রক। খুল্লনার অরণ্যভ্রমণ ও ছাগল চরানো নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিরোধ ও জাতিচ্যুত হওয়ার সমস্যা সম্পর্কে জানায় ধনপতি। খুল্লনা ইতিমধ্যে সতীত্ব পরীক্ষা দিয়েছে জৌ-গৃহে প্রবেশ করে।

বাঙালি সংস্কৃতির অপর একটি দিক এখানে দেখান লেখক। সে হল পতির পত্নীপ্রীতি। অকুণ্ঠ ধনপতি রাজাকে জানায় 'রায়, লোচনের জলে ভাসি। ভাবিনি ফিরে পাব খুল্লনাকে। বুক চাপড়ে কাঁদি। ছুটে যাই জৌ-গৃহের দিকে।'[৩]

বহুপত্নীক সমাজে স্বামীর স্ত্রীর প্রতি এই প্রেম ও অগাধ আস্থা পাঠককে মুগ্ধ করে। তবে রাজাজ্ঞা অটল। তাম্বুল, শালবস্ত্র, লক্ষ মুদ্রা, অশ্ব, বর্ম এবং কাটারি গ্রহণের মাধ্যমে ধনপতিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। বাঙালি সংস্কৃতির এই নিয়োগ প্রথাটি লক্ষণীয়। শুভকর্মে গমনের জন্য তাম্বুলদান ও তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দান। ধনপতির গৃহপ্রীতি বাঙালির চিরকালীন গৃহপ্রীতির সঙ্গে বিজড়িত। মধুক্ষরা জীবনের সুখের আশ্রয় ত্যাগ করে লবণাক্ত বারিতে

কেই বা চায় বাণিজ্যে যেতে? নিজের সর্বস্ব প্রত্যপর্ণের মাধ্যমে ধনপতির আন্তরিক অভিলাষ- '...শুধু আমাকে ফিরিয়ে দাও উজানি নগর'।[৪]

দ্বিতীয় অধ্যায় 'খুল্লনার আতঙ্ক, লহনার আনন্দ'- তে দেখা যায় বণিক ধনপতির রাশি, অনুরাগ, প্রকৃতি প্রভৃতি বিচার। সংস্কৃতির একটি অন্য পরিমণ্ডল উন্মুক্ত হয় পাঠকের সামনে। লেখক জানান, ধনপতি 'মিথুন রাশির কারণে প্রকৃতি-অনুরক্ত।'[৫]

স্বামীর সিংহলগমনের সংবাদে খুল্লনা ত্রস্ত। পূর্বসময়ের স্মৃতি তার কাছে সজীব। সে অন্তঃসত্ত্বা। আততিভরে তার প্রার্থনা ধনপতি যেন সিংহল না যায়। কিন্তু সংস্কৃতির নির্মমতা বড়ো কঠিন। এ তো জীবিকাগত সংস্কৃতিজনিত বাধ্যতা। পতি প্রবাসে অথচ পত্নী গভ©বতী। এ সংবাদে পুনরায় তার সতীত্বের প্রতি প্রশ্ন উঠতে পারে আশঙ্কা খুল্লনার। স্ত্রীর প্রতি, নিজের ভাবী সন্তানের প্রতি কত©ব্যশীল ধনপতি লেখে সন্দেহভঞ্জন পত্র। সে পত্রে তার সিংহলযাত্রা ও খুল্লনার সতীত্বের প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য প্রাবন্ধিকের মন্তব্য-'পুরুষেরা বহুগামী হলেও নারীদের সতীত্বের ব্যাপারে তারা কঠোর ছিল'।[৬]

লহনা ধনপতিকে প্রবোধ দেয়। দূরদেশে বাণিজ্যে না গেলে বণিকের পেশা তো নিরর্থক। পাশাক্রীড়া আর পারাবত সঙ্গ যে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল তা বোঝা যায় লহনার কথায়। সে স্বামীকে সাহস জোগায় পরবাসে গমনের জন্য। কবিকঙ্কণ সৃষ্ট লহনার উক্তি এরকম-'ভাল হইল সাধু জায় সিংহল নগরে'।[৭] খুল্লনার প্রতি সাধুর প্রীতি লহনার ক্ষোভের কারণ।

তৃতীয় অধ্যায় 'দক্ষিণ পাটনে দৈবজ্ঞের নিষেধ'। দৈবজ্ঞ খড়িবজ্র খাঁকে ডাক পাঠানোর মধ্যো বাঙালি সংস্কৃতির অনন্যতা প্রকাশ পায়। ঘরের মানুষ চায় তার স্বজন যেন বিপদাপন্ন না হয়। সেই শুভাকাঙ্ক্ষার কারণে দৈবজ্ঞের কাছে যাত্রার তিথি জানতে চাওয়া। কিন্তু গণকের ভবিষ্যতবাণী বড়ো রূঢ়। তাঁর বাণীতে রুষ্ট ধনপতি। অপমানিত গণকের শাপে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির কিছু রূপচিত্র ধরা পড়ে। ধনী ব্যক্তির যে বিষয়গুলিতে অনীহা সে সংক্রান্ত জীবনযাপনের শাপ দেয় গণক। সে চিৎকৃত কণ্ঠে জানায়- 'সাগরে ডুবুক সাততরী দেমাক,শিরে ভাঙুক সাতমনি বাজ, দু-সতিনে কোন্দল করুক নিত্যদিন, ভিটায় ঘুঘু চরুক জোড়ায় জোড়ায় আর বোদাল মীনের ঝোল-ঝাল-চচ্চড়ি খা দিন-রাত্রি'।[৮]

উচ্চবিত্তের অবস্থা থেকে সমাপতন যে সাধুর অচিরে ঘটবে সেটি মঙ্গল কাব্যের ধারানুসরণে বুঝিয়ে দেন লেখক। তবে এ থেকে স্পষ্ট হয় ধনপতির আপন সত্তার প্রতি অগাধ আস্থার বিষয়টি।

পরের অধ্যায় 'সপ্তডিঙা উত্তোলন'-এ দেখা যায় সাধু ধনপতির পৈতৃক ডিঙাগুলিকে। দেবারাধনার চিত্র বাঙালির পূজার সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। জলদেবতা বরুণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় পূজা। মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়,চন্দ্রপাল, ছোটোমুঠি, গুয়ারেখি ও নাটশালার বিবরণে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির রূপরেখা ফুটে ওঠে। জলযান নির্মাণে সংস্কৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। ধনপতির সমৃদ্ধির প্রতীক এই ডিঙাগুলি।

পরাতীৎ অধ্যায় 'বিনিময়দ্রব্য সংগ্রহ'- তে পাওয়া যায় রামায়ণের প্রসঙ্গ। সিংহলে রামরাজ্য স্থাপনের পর সে রাজ্য খ্যাতনামা। সেখানে বাণিজ্যে যেতে হলে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে আনতে হলে চাই উপযুক্ত বিনিময় দ্রব্য। ঘোটক, হরিণ, পারাবত প্রভৃতি জীব ও নারকেল, শুণ্ঠ, সিঁদুর বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহের জন্য ঘোষক ঘোষণা করে উজানি নগরে। বিনিময়দ্রব্য আহরণের এই প্রথার মধ্যে সুষ্ঠু সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় মেলে। স্বেচ্ছায় নগরবাসী তার দ্রব্য নৌকায় রেখে যাবে। ফেরত যাত্রায় তার অভীষ্ট বস্তু সে সংগ্রহ করবে সদাগরের কাছে।

পারাবতের প্রসঙ্গে লেখক প্রবাদের উল্লেখ করেছেন। পারাবতের বাস ও কথনে গৃহে লক্ষ্মীর আবাস, সব©জনের মঙ্গল। এ প্রসঙ্গে সিংহলসংস্কৃতির পরিচয় পান পাঠক।

'তরণী পূজা' অধ্যায়ে আসে ধনপতির আরাধ্য দেবতা শিবের প্রসঙ্গ। বাণিজ্যতরী গুলির পালে শৈবিক প্রতীক ধনপতির আরাধ্যকে পাঠকের সামনে প্রকাশ করে। সংস্কৃতির এ এক অনবদ্য প্রকাশ।

বস্তুত, ব্যক্তির আরাধ্য তার নিত্যকমে©র মধ্যে থাকে সমাহিত। বণিকবধূদের নৌকাপূজার দৃশ্যটি বড়ো মনোরম। নৌকাপূজার রীতির মধ্যে কলাগাছের খোলায় নির্মিত নৌকায় পরল, সুপারি,কলা,কুল প্রভৃতি দিয়ে পূজার উপচার সাজানোর কথা বলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার সময় কলাগাছের বাণিজ্যতরী নির্মাণ করে বাণিজ্যের সাফল্য কামনা করা হয়। লোকসংস্কৃতির অপরূপতায় দৃশ্যটি সার্থক।

পুরুষ-নারী প্রভেদের সংস্কৃতি সেকালের সমাজে ছিল তা স্পষ্ট করেছেন লেখক। কারণ সাধু বন্দরে বা নদীকূলে গণিকাগমনের সুযোগ পেলেও 'খেদ করে কী হবে খুল্লনা-লহনার!...দু-বালার সব রাত্রি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর। সেখানে সমস্ত কাম ও কামনার মুখে নাগবেড়ি'।[৯]

মকর-সংক্রান্তি পার্বণের তুসু ভেলার গমনপথই তো দক্ষিণ পাটনের যাত্রাপথ। সে পথে চাঁপাতলা, কোঙরবন্দ, দুবরাজপুর, বর্ধমান,গঙ্গাপুর, হাসনহাটি, বৈদ্যপুর, ত্রিবেণী- প্রভৃতি স্থানের নাম পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গোল্লেখের মাধ্যমে লেখক জানান সমকালীন এয়োবতীদের প্রতিজ্ঞার কথা। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের দেহমন শুচি রাখার জন্য। দুর্গাবর নৌকায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গার চিত্র তৎকালীন সময়ে দুর্গাপূজা ও তার জনপ্রিয়তার বিষয়টি স্মরণ করায়।

প্রতিটি ডিঙার পৃথকভাবে পৃথক বন্দনার সঙ্গে পূজনের শেষে কুলপুরোহিত সুবর্ণঘট স্থাপন ও গণপতি দেবের পূজা করেন। যাত্রার আয়োজন হয় সম্পূর্ণ।

পরের অধ্যায় 'খুল্লনার চণ্ডীপূজা'- তে খুল্লনা স্বামীর ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় একাগ্রতার সঙ্গে চণ্ডীপূজা করে। পূজার উপকরণ সবুজ আম্রপল্লব, দিঘল দূর্বা, কুমকুম,কস্তুরী, প্রসূন ও সুপারি। ষোড়শোপচারে প্রদত্ত হয় দেবীর নৈবেদ্য। খুল্লনার কামনা স্বামীর সর্বাত্মক মঙ্গল। পৌরাণিক সংস্কৃতির বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। দেবী চণ্ডী প্রকৃত অর্থে মহামায়া। খুল্লনার প্রার্থনা সেই দেবীর কাছে স্বামীর কল্যাণার্থে। ধনপতির কাছে খুল্লনার পূজার কথা জানায় লহনা। সে ভাবে খুল্লনা ডাকিনীবিদ্যার মন্ত্র পড়ে অর্চনা করছে। এটি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত । গ্রামীণ এলাকা এখনও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। ডাকিনী সন্দেহে একুশ শতকে দাঁড়িয়েও অনেককে জীবন্ত দগ্ধ হতে হয় অথবা হতে হয় গ্রামছাড়া। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনী' গল্পের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়।

'সাধুর কোপ, খুল্লনার বিনয়' অধ্যায়ে ধনপতি ক্রুদ্ধ। শৈব ধনপতির পত্নী স্ত্রীদেবতার পূজনরত। এ বিষয়টি সাধুর কাছে অসহনীয়। লহনা উr ফুল্ল। তার লক্ষ্য সাধিত হয়েছে। ধনপতি পূজাগৃহে প্রবেশের সময় খুল্লনার অপরূপ নৃত্যকলায় মুগ্ধ হয়। নৃত্যের ভঙ্গি, মুদ্রা, তাল, মাত্রা সবই সংস্কৃতির পরিচায়ক। লহনা মুগ্ধ সাধুকে বাস্তবে ফেরায়। সাধু 'চণ্ডীমঙ্গল'এর ধনপতির মতোই কট্টর শৈব। সে দেবীর পূজায় অসম্মত। তার মন্তব্য উল্লেখ্য-'...আমি ধনপতি সদাগর, তুই কিনা তার ধামে পূজিস স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা?'[১০]

পুরুষতান্ত্রিকতার এ এক অমোঘ গর্ব। সাধু খুল্লনার প্রেমিক পতি হলেও তার প্রথম পরিচয় সে পুরুষ। স্ত্রীদেবতা তার অনর্চনীয়া। তার আতঙ্ক যদি সে এর ফলে জাতিচ্যুত হয়! পিতৃশ্রাদ্ধের সময়কালীন জ্ঞাতি-বন্ধুদের অপমানের কথা সাধু স্মরণে আনে খুল্লনার।

খুল্লনা স্পষ্টভাষায় জানায়- 'আমি তো আপন ইচ্ছেয় বনে ছেলি-রাখালি করিনি। ও ছিল সতার আধা-কপট প্রবন্ধবচন, আধা আমার কপাললিখন'।[১১] খুল্লনার অদৃষ্টবিশ্বাস বাঙালি সংস্কৃতির নিয়তিবাদকে স্মরণ করায় পাঠকদের।

নারীত্বের নববিভায় বিভাবতী রমণী দৃপ্তকণ্ঠে জানায় তার লাঞ্ছনার জন্য সে নিজে দায়ী নয়। তার আক্ষেপোক্তি লক্ষণীয়- 'যে-কর্মে আমার একমাত্র অধিকার সেই পাককর্ম তো আমি নিস্পৃহ সম্পন্ন করেছি, নাথ'।[১২]

একুশ শতকের নারীর স্বাধীনতাও কি সে অর্থে সর্বাত্মক? প্রশ্ন জাগতে পারে পাঠকের মনে।
স্মরণে আসে রবীন্দ্রবাণী-

'রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী; সংগোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি'।[১৩]

খুল্লনার যুক্তিপূর্ণ তর্ক সদাগরের পৌরুষে আঘাত হানে। রুষ্ট সাধুর পদাঘাতে খড়ের বিড়া ও দেবীর মঙ্গলঘট ভূলুণ্ঠিত।

'সদাগরের প্রতি চণ্ডী পরম কুপিতা। ধনপতিকৃত অপমান তাঁকে আহত করে। খুল্লনার নির্যাতনে তিনি দুঃখিনী। তাঁর রোষ জগতচরাচর ব্যাপ্ত হয়ে প্রকটিত হয়। পদ্মাবতীর সমীপে অভিযোগ জ্ঞাপন করেন তিনি। সদর্পে জানান- 'ত্রিভুবন দেখুক অবলা নয় নারী, দুর্বলা নয় স্ত্রী-লিঙ্গ দেবতা চণ্ডী'।[১৪]

'চণ্ডীর প্রতি পদ্মার উপদেশ'- এ পদ্মাবতী অভয়াকে যুক্তি দেন। খুল্লনার বৈধব্য তাকে দুঃখকষ্টে জর্জরিত করবে ধরাধামে এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন পদ্মাবতী। ইতিমধ্যে খুল্লনার বিড়াবন্ধনে চণ্ডী সাময়িকভাবে শান্ত হন।

'ধনপতির ডিঙাঘাটায় গমন' অধ্যায়ে খুল্লনার দুর্ভাবনা এক এক করে সত্য হয়। সাধুর যাত্রা যে অযাত্রার সেটি প্রতীয়মান হয়। শুরু হয় হোঁচট লাগা থেকে। বায়সের কণ্ঠ, নীরস বৃক্ষশাখা, যোগিনীর অর্ধেক লাউ ভিক্ষা- এসব সাধুর যাত্রাপথের অশুভ দিকগুলির চিহ্নায়ক। বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে এসব বিষয়গুলি সুপরিচিত। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে বাঙালি সংস্কৃতির এই দিকগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। দাসী দুবলা সাধুকে অনুসরণের পথে এসব লক্ষ করে কুশ ওঝাকে দিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করানোর কথা ভাবে। এটি বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। কোনো গুরুত্বপূর্ণ শুভানুষ্ঠানের পূর্বে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন- হোম বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে সাধু এসবের পরেও নির্বিকার। তার চারিত্রিক দার্ঢ্য এতে ফুটে ওঠে।

ধনপতির স্মৃতিচারণায় উজানির প্রকৃতি ও ভ্রমরার তট যেন নবায়মান হযে ওঠে। সাধু শিবভক্ত। তার মনোভাবে সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচিতি মেলে। ঔপন্যাসিক বলেন- 'ধনপতি কামনা করেছে কল্পতরু। বন্দনা করেছে শিবকে কল্পতরু হিসেবে। তার কাছে কামনায় মেলে শুদ্ধ মন, প্রসন্নচিত্ত, পাবন বিবেক এবং হিতকর হৃদয়'।[১৫] সংস্কৃতির মূলমন্ত্র পূত মনোভাবে নিহিত।

'নৌকারোহণ' অধ্যায়ে ধনপতি নদীপূজা করে। স্মরণ করে সপ্তর্ষিকে। তারপর জল- অঞ্জলি প্রদান করে পিতৃপুরুষকে। বাঙালি সংস্কৃতির অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় এখানে।

ধনপতি কূলে এলে লহনা ও খুল্লনা তাকে বিদায় দেয়। মধ্যযুগের নারী খুল্লনা মধ্যযুগীয় বাঙালি সংস্কৃতিকে মেনে চলেছে ঠিকই। নারীত্বের পরিপূণ©তা তাকে উত্তীর্ণ করেছে শ্রেষ্ঠত্বে। এ প্রসঙ্গে কৃতী সমালোচক বলেছেন-

'বেহুলা চরিত্রের আত্মপ্রত্যয়ের যে দিক তাহার চরিত্রকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিল, খুল্লনার চরিত্রও সেই আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে শক্তিশালী ছিল'।[১৬]

আত্মীয়- পরিজনের শিবনাম স্মরণ করার মধ্যে সেসময় সমাজে শিবপূজার প্রাধান্য সম্পর্কে জানা যায়। বর্তমান সময়ে দেখা যায় যাত্রার পূর্বে দুর্গানাম স্মরণ। সদাগরের গমনের পর খুল্লনাকে বেষ্টন করে এয়োস্ত্রীরা গৃহপানে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এটি নিশাকালে কুদৃষ্টি থেকে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে রক্ষণের একটি সংস্কৃতি।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়-'মঙ্গলকাব্যগুলিকে আজ যে অবস্থায় পাচ্ছি তার মধ্যে কতটা গায়েনের প্রক্ষেপ আছে তা জানবার উপায় নেই। তথাপি কবিকঙ্কণের কাব্য পড়লে এটুকু বোঝা যায় কবি যথাসম্ভব অবান্তর বিষয়কে বজ©ন করেছেন'।[১৭]

সাম্প্রতিক কালের ঔপন্যাসিক সেই বিষয়কে যখন নব্য কথারূপ দেন তখন তার মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির হারানো অথচ চিরন্তনী কথা ফুটে ওঠে আপনা থেকে।

'ডিঙা দর্শনে প্রতীক্ষা' অধ্যায়ে বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্গত সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মেলে পৌষসংক্রান্তির মহোr সবের উল্লেখ। শুকের প্রহেলিকায় আসে কমলে কামিনী প্রসঙ্গ। ভ্রমরার জলে ধনপতির সপ্তডিঙা দর্শনার্থে গাভী, গোবr সদল সহ যায় সমগ্র পল্লী। সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার সাফল্য কামনা করে তারা। দধিকর বলে-

'তীর্থযাত্রা, রথযাত্রা, শবযাত্রা- সব সমবেত যাত্রার পদরেণু মাথায় নিয়ো'।[১৮]

বাঙালি সংস্কৃতির শাশ্বত অভিব্যক্তি এই সংস্কৃতিমনস্কতার সঙ্গে বিজড়িত। ভ্রমরার দুই তটে সে উপক্ষে মিষ্টান্ন বিতরণ থেকে আরম্ভ করে উৎসব চলে। এ আনন্দ সংস্কৃতির মূলে নিহিত। অপরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা নয়; শুভকামনা ও আনন্দ প্রাপ্তিই এর বিশেষত্ব।

উলূকের পরামর্শে বাউল তার সঙ্গীত সংশোধন করে গায়- 'ব্রহ্ম আমার সন্ধ্যারাতে বসত গাড়ে নদীকূলে'।[১৯]

মানুষের নশ্বর দেহ নদীর কূলে চিতাবহ্নিতে দাহ হয়। অন্যদিকে জীবনের প্রান্তিক পর্বে অন্তিম সময়ে মানবমনে আসে ব্রহ্মচেতনা। দর্শনকথায় সম্পৃক্ত গীতিটি তুলে ধরে সংস্কৃতির মেলবন্ধনকে। লালনগীতির মধ্যে সেই একই সুরের মূর্ছনা দেখা যায়-'তিরপিনির তীর-ধারে মীনরূপে সাঁই বিহার করে'।[২০]

ধনপতির যাত্রা এবং যাত্রাপথ সবই যেন এর মাধ্যমে অন্য মাত্রা পায়। এ যাত্রা তো অনন্ত অভিমুখী। বাহ্যিক আবরণের সঙ্গে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও থাকে লুকিয়ে।

পঞ্চদশ অধ্যায় 'কাণ্ডারির আতঙ্ক'- তে যমচতুর্দশী ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। চোদ্দ শাক সংগ্রহ, রন্ধন, ভোজন ও সন্ধ্যায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে চতুর্দশ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন- বাঙালি সংস্কৃতির পুরাতনী দিন স্মরণে আনে। হেমন্তঋতুতে অঘ্রাণসন্ধ্যায় কাণ্ডার বুঢ়ন সন্ধান করে মৃগশিরা নক্ষত্র। যাত্রাপথে নক্ষত্র দেখে দিকনির্ণয়ের সংস্কৃতি জনপ্রিয় ছিল তৎকালীন সমাজে।

'সাধুর লহনাদর্শন' অধ্যায়ে ধনপতির মনে উদিত হয় লহনার মুখমণ্ডল। লহনার প্রতি অবিচারে সাধু অনুতপ্ত। গৃহে সপত্নী এনে গৃহশান্তি ভঙ্গ করেছে সাধু স্বয়ং এই বোধে সে পীড়িত হয়। নদীজলের স্রোতের মধ্যে সবাহন নক্ষত্রপুঞ্জের ভেসে চলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

'নাটশালা' অধ্যায়ের সঙ্গীতটি উল্লেখ্য-

'আমার বাড়িত গেলের মাঝি

বসতে দেব পেড়া
জলপান যে করতে দিবা
চিকন ধানের চূড়া'[২১]

'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র মধ্যে পাওয়া যায় এই ধরণের গান। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ এই সঙ্গীত, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রা তার পরিচয় পাওয়া যায় এ গানে। নাটশালা ডিঙা রঙ্গকৌতুকে আচ্ছন্ন, আবার দুখজাগানিয়া সঙ্গীতের উৎসস্থল।

নাইয়া-গাবর,পাইক,কাণ্ডার সহ ধনপতি চলে বাণিজ্যে। গৃহের নারীরা থাকে অনন্ত প্রতীক্ষায়। এটিও এক সংস্কৃতি। সৈন্যবাহিনির সেনারা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশরক্ষার্থে যুদ্ধ করে আধুনিক যুগে। সেসময় জীবিকার কারণে মানুষ গৃহত্যাগী, প্রবাসী হতে বাধ্য হয়। মরমী ঔপন্যাসিক বলেন-

'তটিনীর যেমন কূল ভাঙে তেমন নারীরও বুক ভাঙে, নাইয়া, রে। সে ভাঙনের ধ্বনি জাগে না, সে ভাঙনের ভূমিভেদ চক্ষে পড়ে না, সে ভাঙনের আঘাত লাগে না অন্য কারো দেহে তাই সংসারে এত সুখ'।[২২]

নারীর মর্মযন্ত্রণা পোষণ ও বিরহবিধুর অবস্থায় দিনাতিপাত করা এক কৃচ্ছ্রসাধনের সংস্কৃতি। তৎকালীন সময় যোগাযোগের বিষয়টি একালের মতো উন্নত হয়ে ওঠেনি।

বাউলের সঙ্গীতে জীবনের চিরায়ত কামনার প্রতিরূপ-

'তুই যাস না রে মন পাখি তুই ফিরা আই,
ওরে শুক-শারি নামে পাখি আয় হৃদি পিঞ্জরায়'।[২৩]

প্রতিতুলনায় উল্লেখ্য লালনগীতি-

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়'।[২৪]

পরবর্তী অধ্যায় 'ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রাণী'। এ অধ্যায়ে দধিবিক্রেতা, লবণবিক্রেতা, মাংসবিক্রেতা বিবিধ কর্মসংস্কৃতির মানুষের দেখা মেলে।

রন্ধনকারী পণ্ডিত যেসব খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে তার মধ্যে বাঙালির মধ্যযুগীয় খাদ্য-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বেগুন, কুমড়ো,কচু,কাঁচকলা, সজনে ডাঁটা, বেথুয়া শাক, পটল প্রভৃতি সবজির নামোল্লেখ করেছেন লেখক। বেথুয়া শাকভাজা, সুক্তা, ঘিয়ে ভাজা পটল, কাতলা মাছের ঝোল, তেঁতুল সহযোগে শোলমাছের অম্বল বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির পরিচায়ক। হিং, জিরে প্রভৃতি মশলা ব্যবহারের উল্লেখ মেলে।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ্য-

'সবিশেষ, মঙ্গলকাব্যের ভিতর রসনা ও বাসনা এমন একটি মাত্রা লাভ করেছে যে এ যেন হয়ে উঠেছে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়'।[২৫]

অঘ্রাণ মাসে কার্তিকপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেকালে কাতি©ক পূজার প্রচলন ছিল সেটি জানা যায়।

'অজয়যাত্রা' অধ্যায়ে অজয়নদের দক্ষিণতটে বিবাহোr সবের চিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। ধানকাটার দৃশ্যের সাথে লেখক বিভিন্ন শস্য যেমন যব, কড়াই, খেসারি, মুসুরি, তিসি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মীপূজা, রাসযাত্রা, ইতু পূজা প্রভৃতি পূজনসংস্কৃতির প্রসঙ্গ এসেছে উপন্যাসে। অর্থাৎ গমনপথে অঘ্রাণমাসের সময় কীভাবে

অতিক্রান্ত হচ্ছে তার পরিচয় সুকৌশলে দিয়েছেন লেখক। ভাগীরথী-অজয় সঙ্গমস্থলে ধনপতির শিবনাম স্মরণ সংস্কৃতির পরিচায়ক। অজানিত বিপত্তি থেকে মুক্তির আশায় ভক্ত ধনপতি অশিব অর্থাৎ অমঙ্গলকে দূর করতে চায়।

'নদী-সংগ্রামে ধনপতি' অধ্যায়ে নদীযাত্রার মধ্যে বায়সের কণ্ঠে কা-কা রবে ফুটে ওঠে জীবনদর্শনের চিত্র। মানুষের পরিচয়, তার কর্ম, তার বিষয়-সন্ধানের দর্শন সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয়বাহী।

এ অধ্যায়ে পাওয়া যায় দেবী দুর্গাসহ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, রাধা-এ পঞ্চদেবীর আরাধনাকথা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক সংস্কৃতিসম্ভূতা দেবী ধনপতির পূজনীয়া। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতিসম্ভূতা দেবী চণ্ডী তার কাছে অপূজ্যা।

'নয় দীয়া, নয় দ্বীপ' অধ্যায়ে গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্তে মেলে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গে। জলস্রোতে অতিক্রান্ত হয় স্থানসমূহ। মঙ্গলসংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেন ঔপন্যাসিক-'কখনো স্বপনে দেখা দেয় দেবী, কখনো জাগরণে দেখা দেয় দেব'।[২৬]

স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে মধ্যযুগে হতো মঙ্গলকাব্য রচনা। এ সেই লুপ্ত সংস্কৃতির অঙ্গ। আমলকী, হরীতকী, নিম, বেল প্রভৃতি বৃক্ষের উল্লেখ মেলে এ অধ্যায়ে।

'ভাগীরথী স্রোতে নিশিযাত্রা' অধ্যায়ে নক্ষত্রের গতিবিধিমাফিক নৌকা চালায় কাণ্ডার। নক্ষত্রের শুভাবস্থান তরীর গতিকে দ্রুত করবে- এই কল্পনায় সে হৃষ্ট। কোদালিয়া ও হালিশহরের পর তরণী চলে ত্রিবেণীর উদ্দেশ্যে।

'মুক্তবেণী' অধ্যায়ে প্রতীত হয় যে, নৌবহর এসেছে ত্রিবেণীতে। শুকশারির প্রহেলিকা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এসেছে ফিরে ফিরে। ধনপতি গৌড়ে শুকশারির সুবর্ণপিঞ্জর নির্মাণার্থে গিয়েছিল। আরাকান রাজসভার অনূদিত কাব্য 'পদ্মাবতী'-তে পাওয়া যায় শুকপাখির উল্লেখ। অর্থাৎ এ সংস্কৃতি বাংলা ও বাঙালির অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রয়ী নদীর সঙ্গমে পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী। তীর্থান্ন গ্রহণ করে ধনপতি ও তার তরীর সহযোগীরা। ত্রিবেণীতে পারলৌকিক ক্রিয়া খ্যাত বাঙালি সমাজে। পাঠক সেই তীর্থের উল্লেখ পান এ উপন্যাসে।

'অনুপাম সপ্তগ্রাম' অধ্যায়ে সপ্তগ্রামের তটে দূর- দূরান্তের সদাগরদের সাথে আলাপ ঘটে ধনপতির। তাদের সঙ্গে জীবিকাগত সাদৃশ্য আছে তার। চলে কথালাপ। সপ্তগ্রামবাসী ধনপতির বান্ধবদল মিষ্টান্ন পাঠায় ডিঙার জন্য। এ হল বাঙালির চিরন্তন আতিথেয়তা সংস্কৃতি। দ্যূতক্রীড়ায় রত বণিকদের প্রসঙ্গোল্লেখের মাধ্যমে লেখক বৈঠকপ্রিয় বাঙালির সংস্কৃতিকে মনে করিয়ে দেন।

'মগরার পথে' অধ্যায়ে নিমাইতীর্থ ঘাট পড়ে নৌবহরের পথে। খড়দহ দর্শনে নমন করে নাবিকদল। পরম পুণ্যের সংস্কৃতিক্ষেত্র এটি। বৈষ্ণবীয় আখ্যান স্মরণে নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্রের জয় ঘোষণা করে তারা। ভাগীরথীতটে ধনপতি মৃৎশিব নির্মাণ সহকারে অর্চনা করে আরাধ্যের। ব্যঞ্জনের প্রথম পদ সমর্পিত হয় অগ্নিদেবের উদ্দেশে। সংস্কৃতির এই পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ দিকগুলি ফুটে উঠেছে উপন্যাসে।

ধরণীতে চক্রতীর্থ নামে খ্যাত স্থানে স্নান করলে সুপুত্রের জন্ম হয়। সংস্কৃতির এই বিশ্বাস আজও মানুষের মনে বিদ্যামান। তাই দেবার্চনা, পূজা, মানসিক ইত্যাদি সম্পন্ন করে মানুষ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঔপন্যাসিকের স্বীয় অভিমত- 'হালিশহর, নবদ্বীপ, ললিতপুর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি নামের পুরাণ ইতিহাসে আমরা ভুলে গিয়েছি। ঔপনিবেশিক শাসনে হারিয়ে গিয়েছে প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির অনেক পুরনো খাবার। ধনপতি-তে সেই যুগটাকে আমি নতুন করে নির্মাণ করতে চেয়েছি'।[২৭]

এই সংস্কৃতি বাঙালির একান্ত নিজস্ব। সেই বিস্মৃত যুগের সংস্কৃতিই তো 'ধনপতির সিংহলযাত্র'-র উপজীব্য।

মধ্যরাত্রির নদীবুকে চলে সপ্তডিঙা। বিভিন্ন স্থানের লৌকিক সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন লেখক। সপ্তডিঙার যাত্রাপথের স্মৃতিকে স্মরণে রেখে একালের প্রাবন্ধিক বলেন, উপন্যাসে 'লোকশ্রুতি ও লোকস্মৃতির ব্যবহার বর্ণনাকে অলঙ্কৃত করেছে'।[২৮]

উত্তর অধ্যায় 'পদ্মাবতী সকাশে ভগবতী'-তে দেবী চণ্ডী ধনপতির জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাতাবরণ নির্মাণ করেন দেবরাজের সহায়তায়।

'নদ-নদীর মগরা গমন' অধ্যায়ে চণ্ডিকার নির্দেশে নদ-নদীরা সমবেতভাবে আসে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা পণ্ড করার অভিপ্রায়ে। গঙ্গার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রবাহিত হয় আমোদর। এক্তেশ্বর দেউল, বাঁকুড়া রায়-কে অতিক্রম করে সে। কোপাইয়ের গতিপথে পড়ে কঙ্কালীতলা। সে দেবীর অপমানের কথা শুনে বেগে বয়ে চলে।

কুমড়ো,পটল,শাক,বেগুন,খাম-আলু, বরবটি বিভিন্ন প্রজাতির লেবু বৃক্ষে বিদ্যমান। তারা জলমগ্ন হয় এই প্লাবনে। মাছরাঙা, পানকৌড়ি, শঙ্খচিল, সারস নদীকূলে আসে।

এই প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচনাকালের প্রসঙ্গ। লেখক জানান 'যে-সব কর্মহীন বালক গুরুগৃহে 'শাকে রস রস বেদ' করত তারা পুঁথি ফেলে মহানন্দে চলে রোহিত-কাতল-চিতল চিঙ্গিড়া ধরতে'।[২৯]

মঙ্গলসংস্কৃতির উল্লেখ এভাবেই উঠে আসে এ উপন্যাসে। তারিখ ও নির্ঘণ্টের দ্বারা তিথি নির্ণয়ের বিষয়টি জানা যায় উপন্যাসে। ২৯ শে পৌষ তারিখে সংক্রান্তির উৎসবের কথা, মকরস্নানের প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক।

'ডুবুডুবু সপ্তডিঙা' অধ্যায়ে সপ্ততরীর ডুবন্ত অবস্থার দৃশ্য দেখা যায়। দেবীর কোপে ধনপতির এই দুরবস্থা সেকথা ডিঙার সকলে স্মরণ করে। শুকের প্রহেলিকা এ প্রলয়কালেও রচিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আক্রমণে সন্ত্রস্ত নাবিকদল শিবনাম স্মরণ করে।

'ছয় নিষ্পদের অতলযাত্রা' অধ্যায়ে সাধু ও নৌকারোহীদের সমবেত শিবনাম স্মরণে নদীস্রোত আলোড়িত। চণ্ডী উভয়সঙ্কটে পড়েন। তিনি বলেন- 'নিত্যদিন সাধু শুদ্ধমতিতে পশুপতির পূজা করে, তাই তার 'শিব' ডাকে এত স্বরাগম'।[৩০]

পদ্মাবতীর পরামর্শে ডিঙাগুলির নিমজ্জনপর্ব সমাধা হলে অন্নরক্ষক পেচক মঙ্গলচণ্ডীর নিবেদন রাখে-'এই ধরণীতে তোমার ধ্যান ও পূজা যখন প্রতিষ্ঠা পাবে দিনটিকে নিরন্ন কোরো হে দেবী'।[৩১]

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত পালনে অন্নভোজন সে কারণে নিষিদ্ধ। ষড় ডিঙার নিমজ্জনে সাধু হতাশ ও ভগ্নোদ্যম। সে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিলেও বৃদ্ধ কাণ্ডার বুঢ়ন তাকে রক্ষা করে। ধনপতির প্রাণরক্ষার মাধ্যমে পরম্পরার ঐতিহ্য রক্ষা করে কাণ্ডার। এই সংস্কৃতি সে ধনপতির পিতার কাল থেকে রক্ষা করে আসছে। এ বিশ্বাস, ভরসা ও কর্তব্যপরায়ণতা সংস্কৃতির ফসল।

'একা ভাসে দুর্গাবর' অধ্যায়ে সদাগর ও নাবিকদল চিন্তামগ্ন। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ছয় ডিঙা রসাতলে। এখন গন্তব্যের পানে আশাহতভাবে তাকানো ছাড়া উপায় কি!

'সংকেতমাধব প্রদক্ষিণ' অধ্যায়ে মাধব-দেউলে পূজা অর্পণ করে সদাগর। অশ্বত্থ বৃক্ষে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-নারায়ণের নিবাস। সদাগর একাগ্রচিত্তে পূজা করে সেখানে। প্রলয়ের পর এ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সাধুর কাছে প্রত্যাশিত। দেউলের গাত্রে মাধবের দশাবতার রূপ অতি অপরূপ ও দৃষ্টিনন্দন। চিত্রসংস্কৃতির এই বাঙালিয়ানার রূপ লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। পূজার মধ্যে ধনপতি স্মৃতিচারণ করে তার স্বজনপরিবৃত উজানি নগরের। এই গৃহটান, ঘরমুখীনতা বাঙালির একান্ত নিজস্ব। ঘরোয়া জীবনের তৃপ্তি ধনপতি সেকারণে বিস্মরণ করতে অসমর্থ।

'নীলাচল যাত্রা' অধ্যায়ে দুর্গাবর সংস্কার করা হয়। এখানে পাওয়া যায় দুর্গাবরের যাত্রা সূচনায় নাবিকদলের দুর্গনাম স্মরণ। ধনপতি স্মরণ করে আরাধ্য মহাদেবকে। কদলী দেশবাসিনী এক নারী দিবাবসানে উপচার অর্পণ করে গৃহবাসিনী বিবাহিতাদের সাধব্য বজায় রাখার জন্য। এ মঙ্গলকামনা বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জরা শবরের তিরবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের গতপ্রাণ হওয়ার আখ্যান লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন। সে প্রসঙ্গে এসেছে 'শ্রীমদ্ভগবতগীতা'-র সারকথা। আত্মা অমর এবং অবিনাশী। দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা অমৃতলোকবাসী।

শ্রীক্ষেত্র পুরীতে প্রবেশের পূর্বে নীলমাধব বিগ্রহ ও জগন্নাথের দারুবিগ্রহের আখ্যান নতুনভাবে রচনা করেন ঔপন্যাসিক। শ্রীক্ষেত্রের কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা মূর্তি অসম্পূর্ণ থাকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন লেখক। কিংবদন্তী ও পুণ্যগাথার সমাবেশে অধ্যায়টি হয়েছে উপভোগ্য। শ্রীক্ষেত্রের সংস্কৃতির অত্যন্ত বিশিষ্টতাবাহী। নীলাচলের তীরে অবতরণের পূর্বে জগন্নাথবন্দনা করে সাধু ও নাবিকদল। কোনো পুণ্যক্ষেত্রে অবতরণের পূর্বে এই শুভ আচার বাঙালি সংস্কৃতির অন্তগ©ত।

'জগন্নাথধামে ধনপতি' অধ্যায়ে ধনপতি শ্রীক্ষেত্রে পূজা করে জগন্নাথবিগ্রহ। কিন্তু মনোবেদনায় শ্রান্ত তার দেহমন। যে প্রাণগুলি ষড়ডিঙার সঙ্গে সলিলে গতপ্রাণ হল তাদের প্রত্যাবর্তনের উপায় তো নেই। সদাগর তার দায়িত্ব পূর্তিতে ব্যার্থ। এ গ্লানি দুর্মোচ্য। লক্ষ্মীবন্দনায় শ্রীক্ষেত্র মুখরিত। নবদম্পতির ভাবী সুখের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ। উপন্যাসে তারই ছায়াপাত। নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযাপনের চিত্র যে সরল সুখের আভাস আনে; তাতে পাঠকের মনে পড়ে দুঃখিনী খুল্লনার কথা। উপন্যাসের গীতে তারই রেখাপাত-

'মোর মনের দুখের কথা বলি গো কাহারে/ঘরের মানুহ বসত করে কোন নাগিনির ঘরে'। [৩২]

পরের অধ্যায় 'পূর্ণচন্দ্রে সাগরযাত্রা'। কাণ্ডার বুঢ়ন সাগরজলের কম্পন-উতরোল দেখে সাগরমন্থন বৃন্তান্ত শোনায় নাবিকদের।

জলৌকাদহ অতিক্রম' অধ্যায়ে ধনপতির স্মৃতিচারণ বড়ো মর্মস্পর্শী। পারাবতক্রীড়া, মুকুন্দ-মাধব-কংসারি প্রমুখ বান্ধবের সঙ্গে সমবেত আনন্দ উদৎযাপনের স্মৃতি তার হৃদয় কম্পিত করে। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নাম এ প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ সুকৌশলে ব্যাবহার করেছেন ধনপতির বান্ধবদের নামকরণে। সে প্রসঙ্গ উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঔপন্যাসিকের সৌন্দর্যমণ্ডিত মন্তব্য-

'ভ্রমরার গৃহী স্রোত হতে এই জলধিযাত্রা যেন মাতৃক্রোড় হতে পরিব্রাজকের জগৎবিহার'।[৩৩]
কাণ্ডার বুঢ়নের দক্ষ নৌচালনায় সকুশলে জলৌকাদহ পার হয় তারা।

উত্তর অধ্যায় 'শঙ্খদ্বীপে ধনপতি'-তে শঙ্খদ্বীপের অভূতপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ ডিঙার সকলে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুবর্ণভূমি শঙ্খদ্বীপের অনন্যতায় মুগ্ধ ধনপতি কাতর হয় খুল্লনার জন্য। সুখী নয়ন দু'টি আরো সুখী হতে চায় প্রবাসে পত্নীমুখ দর্শনের মাধ্যমে।

'দিগৎভ্রান্ত দুর্গাবর' অধ্যায়ে আবহাওয়া প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। একদল শুশুক দুর্গাবরের আগে যায় চড়কতলার শিবনৃত্যে যোগদান করার ভঙ্গিমায়। এ দৃশ্য বাঙালির চড়কপূজার সংস্কৃতির প্রসঙ্গ মনে আনে।

'সর্পদহে সদাগর'-অধ্যায়ে কশ্যপমুনির দুই স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক। মনসামঙ্গলের আখ্যানে লখিন্দরকে কালনাগিনীর দংশনসংক্রান্ত বিষয়টি এ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। কদ্রুতনয়দের নাম উল্লেখ করেছেন লেখক।

'রামের জাঙ্গাল'-এ রামকথার ইতিহাস এনেছেন ঔপন্যাসিক। সীতা উদ্ধারে জাঙ্গাল নির্মাণের পরিকল্পনার সাফল্যের কাহিনি লেখক অসাধারণ পন্থায় ব্যক্ত করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের শিবপূজনের কথা স্মরণ করে শিবভক্ত সাধু। সে আন্তরিক অনুনয়ে জানায় সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তন কালে শ্রীরাম প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের আরাধনা করেবে।

'আড়খান' অধ্যায়ে রামায়ণ প্রসঙ্গ পুনর্বার ধ্বনিত হয় শুকশারির হেঁয়ালিতে-

'সকল গুণের ধাম ভানু-বংশে রাজা রাম
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি
রাম সহ গেল বন সীতা হরে দশানন
রামায়ণে এই কথা শুনি'।[৩৪]

পরবর্তী অধ্যায়ের নাম 'কমলে কামিনী'। অমাবস্যার দিন এক শঙ্খচিলের অপমৃত্যু ঘটে দুর্গাবরে। শঙ্কিত নাবিকদল তথা ধনপতি। শুভচিহ্নায়কের প্রয়াণ বড়ো অমঙ্গলসূচক। নিশীথবেলায় পদ্মাবতীর পরামর্শে দেবী চণ্ডিকা দুর্গাবরের যাত্রাপথে ধনপতিকে দেখান কমলেকামিনী রূপ। অভয়া-নিক্ষিপ্ত কামশরে সাধু অচৈতন্য। কিন্তু সংজ্ঞা ফিরলে ধনপতির প্রথম বাক্য- '...ওই দেখ চতুঃষষ্টি কমলে রাজনন্দিনী হাসে পঙ্কজ বনে'।[৩৫]

মায়াজালে বশীভূত সাধুকে কাণ্ডার বারণ করে এ বিষয়ে চিন্তা করতে। সিংহলরাজের কঠোরতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মঙ্গলচিন্তক কাণ্ডার সদাগরকে জানায় আপাতত এ বিষয়ে বিস্মৃত হতে। কিন্তু প্রকৃতি অনুরক্ত ধনপতি স্বভাবতই কামার্ত। চণ্ডীর অপরূপ সৌন্দয© তার বাসনার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। দেবীর অনিন্দ্যসুন্দর কান্তিসমৃদ্ধ এই রূপ 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখিত। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ্য- 'পৌরাণিক চণ্ডী এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীতে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মুকুন্দরামের অভয়াচণ্ডী অনেকাংশে লৌকিক'।[৩৬]

লৌকিক রূপে দীপ্তিময়ী দেবীর সৌন্দর্য- সম্মোহিত সদাগর কমলেকামিনীর সঙ্গপ্রার্থী।

'লঙ্কাতীরে দুর্গাবর' অধ্যায়ে সিংহলে অবতরণ করে সাধু শিবনাম স্মরণসহকারে। বিল্ববৃক্ষের তলায় সাধু ধ্যানমগ্ন। কিন্তু কোটালের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড ও জনসমাগমের বিষয় নিয়ে তর্ক বাধে সাধুর। তার পারিতোষিকের ব্যবস্থা হওয়ায় সে মিষ্টভাষণে সিংহলে স্বাগত জানয় সাধুকে।

'সাধুর রাজসভা গমন' অধ্যায়ে রাজসমীপে ধনপতি নিবেদন করে তার সিংহল আগমনের হেতু। রাজসন্নিধানে ভেট রাখার মাধ্যমে সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। বিনিময় দ্রব্যসমূহের নাম সে জানায় রাজাকে। বিনিময়ে সম্মত হন নৃপতি। কিছু পরে সাধুকে পুনরায় ডেকে পাঠানো হয় রাজসভায়। যে যাত্রায় বায়সের কর্কশ কণ্ঠ, শৃগালের দল প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা যায়।

ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে কমলেকামিনীর কথা স্মরণ করে সাধু। তার যাত্রাপথে সিংহলের কালিয়দহে এই অপরূপা জলকুমারীর কথা শুনে রাজা রাগত হন। লঙ্কাদ্বীপের বাণিজ্য যাতে সাধুর কল্পকথনে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করলেও সাধু দৃঢ় থাকে তার বয়ানে। সে প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখে কমলেকামিনীর বাস্তবিকতার কথা। বাস্তবতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে ১২ বছরের বন্দিদশা স্বেচ্ছায় করার প্রতিজ্ঞা করে ধনপতি। রাজা জানান, কমলেকামিনী সত্য হলে সিংহলের অর্ধরাজত্ব আর রাজসিংহাসন সাধুর প্রাপ্য হবে।

পরের অধ্যায় 'লঙ্কাবাসীর রত্নমালা যাত্রা'-তে নৃপতি শালবাহনের রাজত্বে মহাসমারোহ চলে কালিয়দহ-তে কমলেকামিনী দর্শনের প্রস্তুতি। সেই উপলক্ষে প্রকৃতি থেকে মানব সকলে প্রস্তুত হয় এ হেন অভূতপূর্ব দৃশ্য চাক্ষুষ করতে। তার একটি অংশ উল্লেখ্য-'শত পিনাকে সুর তোলে বাদ্যকারদল কালিয়দহের জলে, কুমারী কমলদলে/গজ গিলে উগারে অঙ্গনা'।[৩৭]

সিংহলদ্বীপবাসীরা রত্নমালা সেতুবন্ধে চলে সেই দৃশ্য অবলোকনে। পেচক ও চীর পরিহিত যোগীর কথোপকথনে উদঘাটিত হয় জীবনসত্য। যোগীর মন্তব্য উল্লেখ্য- 'কালিয়দহ নয় হে, জগৎবাসীর চূড়ান্ত গন্তব্য হল খসর্পণ।'[৩৮]

জীবনের চরম প্রার্থীত বস্তু রূপে যে শক্তি ও দম্ভের লীলা চলেছে তাতে নীীবগকার এই যোগী। পূর্বে বাউলের সঙ্গীতে সেই তত্ত্বের প্রকাশ। প্রকৃতি স্বভাবত লীলাময়ী। তাকে বশীভূত করতে চাইলে ফল বিপরীত ফলে।

'না কমল না কামিনী' অধ্যায়ে সিংহলরাজের তরণীগুলি সারিবদ্ধভাবে চলে। সিন্ধুঘোটক, হংসরাজ, কেকাবলী, মকরযান প্রভৃতি ডিঙাগুলির নাম। দুর্গাবর চলে এই তরণীশ্রেণির সাথে। বৃদ্ধ কাণ্ডারহৃদয় অজানিত শঙ্কায় ত্রস্ত। সে যেন বুঝতে পারে এই যাত্রার অসারতা। তাই নৌকার গতি ধীরবেগ করতে সে প্রয়াসী। কিন্তু তার আশঙ্কা সত্য করে কালিয়দহ মন্থন করেও সন্ধান মেলে না কমলেকামিনীর।

'ডিঙা লুণ্ঠন' অধ্যায়ে ধনপতির প্রতি পুনর্বার প্রশ্ন করলে সে জানায় কাণ্ডার বুঢ়নও দেখেছে কমলেকামিনী। নৃপতির আজ্ঞায় সিন্ধুসম্মুখে মিথ্যাকথনে অপারগ বৃদ্ধ সত্য বলে। সে তো নিজ নয়নে প্রত্যক্ষ করেনি সে দৃশ্য। দোষারোপ করে না ধনপতিকেও। তার বারণ লঙ্ঘনের ফল ভুগতে ধনপতিকেই। কিন্তু পুত্রতুল্য সাধুর বন্দিদশা তার কাছে অসহনীয়। তবু সে মিথ্যাকথনে অনভ্যস্ত। এ এক মহান সংস্কৃতি; বিশ্বাস ও সত্যের সংস্কৃতি। রাজাদেশে লুণ্ঠিত হয় দুর্গাবর। ধনপতিহীন দুর্গাবরসহ কাণ্ডার ফিরে চলে উজানির পানে। এ প্রসঙ্গে একালের সমালোচক বলেন-

'এখানে ধনপতি বাণিজ্যযাত্রার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে অমোঘ নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ এক ট্রাজিক চরিত্রের বেদনাময় পরিণতির দিকে যাত্রা'।[৩৯] এই নিয়তিবাদ বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ।

পরের অধ্যায় 'বন্দিশালে ধনপতি'- তে বন্দিশালার ভয়াবহ পরিবেশ বণি©ত করার পর জরতী ব্রাহ্মণীর বেশে অভয়া দেখা দেন দণ্ডিত ধনপতিকে। কিন্তু ব্রাহ্মণী সকলের অলক্ষ্যে থেকে যান মায়া প্রভাবে।পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হলে ধনপতি তাঁর পূজা করুক এই স্বপ্নাদেশ দেবী ধনপতিকে দেন। কিন্তু অটল পণ সাধুর-'মহেশঠাকুর ভিন্ন অন্য কেহ নাহি জানি'।[৪০]

রোষবচনের মাধ্যমে ধনপতিকে সন্ত্রস্ত করতে চাইলেও তার অভিব্যক্তি নির্ভয়। সে কারণে বধির বা মূক হওয়ার কথায় অবিচল সাধু। ঔপন্যাসিকের মন্তব্যে ফুটে ওঠে ধনপতির নবরূপ-

'ধনপতি বলে, বাক&শক্তি হরণের পূর্বে বলব একটিই কথা, শতরূপ চণ্ডীর শ্রেষ্ঠ রূপটি হল কমলে কামিনী। অধর যেন পক্ক বিম্বিকাফল, বদন শরদ-ইন্দু, আঁখি কুরঙ্গলোচন।...এ-রূপ পূজ্য হবে কেমনে?'[৪১]

দেবী সাধুর কামিনী ও কাঞ্চন ভাবনাকে ধিক্কার জানান। কিন্তু দেবীর ভয়াল রূপ দর্শনের পূর্বে নিদ্রিত হয় ধনপতি। চণ্ডীবারি স্থাপনে বা অভয়া পূজনে অভিরুচি নেই তার।

এক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মনে হয় একটি কবিতা ও তার অনুবাদ-

'অব না রোয়েঙ্গে হম খুশী কে লিয়ে
গম হি কাফি হ্যায় জিন্দগী কে লিয়ে।
যো হমেঁ জখম দেকে ছোড় গয়া
হম তড়প&তে রহেঁ উসী কে লিয়ে'।

প্রাবন্ধিক বলছেন-যদি উর্দু গজলের সরলে ভাষান্তর করি তা হলে,

'কাঁদবনা আর সুখের জন্য
দুঃখই অনেক, এ জীবনের জন্য।
ব্যথা দিয়ে যে চলে গেল
রইলাম বেঁচে তারই জন্য।'[৪২]

এ পুরুষকার ধনপতির একান্ত নিজস্ব। সে নতমস্তকে মেনে নেয়নি দেবী চণ্ডীর কথা। স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল সাধুর এই বন্দিত্বতেই উপন্যাসের ইতি ঘটিয়েছেন লেখক। পূর্বাপর কোনো নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেননি সাধুর চরিত্র

সম্পর্কে। অন্তিম অধ্যায় 'গীতময় লঙ্কা দ্বীপ'। এ অধ্যায়ে ঋতুচক্রের পরিবর্তন এবং সিংহলীয় সংস্কৃতির খণ্ডচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ধনপতির বন্দিত্ব বন্দিশালের বাইরের জীবনকে করেনি প্রভাবিত। এ অধ্যায়ে ধনপতির কথা উল্লেখ করেননি লেখক। প্রকৃতির পট পরিবর্তনের সঙ্গে শারদীয়া সময় আসন্ন। দ্বীপবাসীরা জলধারা বন্ধনের দ্বারা অর্চনা করে মহেশের। অকালবোধনের পূজায় প্রতিমা নির্মাণে রত শিল্পী। দেবীহস্তের অস্ত্রের জন্য খড়্গ নির্মাণ করে লৌহকার। তার গীতি উল্লেখ্য-

'বদন ঈষৎমেলে কুঞ্জর উগারে গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার'।[৪৩]

সিংহলীয় সংস্কৃতির মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির অদেখা এই কমলেকামিনী রূপের মাধুর্য হয়েছে সমবেত। তারই ফলশ্রুতি নিম্নবর্গীয় মানুষের গানে, কথায় ও আলোচনায় কমলেকামিনীর প্রসঙ্গ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কৃতী সমালোচকের মন্তব্য-

'জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ ধর্ম, সমাজবোধ ও সাহিত্যরূপী যে ত্রিধারার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, উহারাই সংস্কৃতির মূলে রসসিঞ্চনের প্রধান হেতু'।[৪৪]

বাঙালি সংস্কৃতির বহু বিরল এবং কিছু সুলভ চিত্রবিচিত্র উপাদান ছড়িয়ে আছে সমগ্র উপন্যাসে। সাহিত্য মানবসভ্যতার প্রাচীন বৈশিষ্ট্যকে প্রতিবিম্বিত করার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে মানুষের সমাজমনস্কতা। সেই উদ্দেশ্য অনেকখানি পূর্ণ হয়েছে দীর্ঘ এ উপন্যাসে। অনেক হারিয়ে যাওয়া শব্দ যেমন- পলাকড়ি অর্থে পটল, চলদল বৃক্ষ অর্থে অশ্বত্থ গাছ, সর্পি অর্থে ঘি ইত্যাদি এ উপন্যাসের শব্দগত সম্পদ। ধনপতির যাত্রায় যেন পাঠকও সঙ্গী হয়ে যান নিজের অজান্তে। সদাগরের উজানিনগর থেকে বাধ্য হয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশে গমন বাঙালির নস্ট্যালজিয়াকে বাড়িয়ে তোলে। লহনা-খুল্লনার বিরহব্যথা পাঠকচিত্তে জাগায় সহানুভূতি। কমলেকামিনী রূপের বিবরণে মুগ্ধ পাঠকো যেন মনশ্চক্ষুতে দর্শন করেন সেই স্বকল্পিত অনিন্দ্যকান্তি। জীবনছন্দের সুরে সুরেলা উপন্যাস; মূর্ছনাময় তার ভাষা তথা আঙ্গিক। একালের বাঙালি পাঠক এ উপন্যাসে সেজন্য বাঙালি সংস্কৃতিকে আরেকবার আপন করে নেবার সুযোগ পান। মঙ্গলকাব্যীয় বাঙালি সংস্কৃতির বিস্মৃত আখ্যান এ উপন্যাসে পাঠকের কাছে ধরা দেয় নতুন ভাবে, নতুন সাজে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, (সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস), জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ.১৫।
২. শ্রীকুমার আন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪, সপ্তম সংস্করণ, পৃ.৮।
৩. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.১৪।
৪. তদেব।
৫. তদেব, পৃ.১৬।
৬. তবু একলব্য (ত্রৈমাসিক), মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা, (সম্পা, দীপঙ্কর মল্লিক), দ্র. আদিত্যকুমার লালা রচিত গৌড়ীয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গৌড়বঙ্গের সমাজ ও পরিবার জীবন শীর্ষক প্রবন্ধ, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৫, পৃ.২৫৮।
৭. মুকুন্দ চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, (সম্পা.সুকুমার সেন), সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩, পৃ.১৯৩।
৮. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.১৯।

৯. তদেব,পৃ.৩০।
১০. তদেব, পৃ.৪১।
১১. তদেব, পৃ.৪২।
১২. তদেব।
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রাঙ্গদা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড,১৯০৮, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী সংস্করণ, পৃ.২৩৬।
১৪. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৯।
১৫. তদেব, পৃ.৬৩।
১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৮,পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ, পৃ.৫৩৩।
১৭. বিজিত দত্ত, কবিকঙ্কণের দেবখণ্ড : ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস, (কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা), (সম্পা. আশিস কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায়), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.৯২-৯৩।
১৮. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.৭৩।
১৯. তদেব, পৃ.৭৬।
২০. আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক), অভীক সরকার (সম্পা.), দ্র. আবীর মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ লালনসাঁই, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি,২০১৬।
২১. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা,২০১০,পৃ.৮৪।
২২. তদেব,পৃ.৮৬।
২৩. তদেব, পৃ.৮৮।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোরা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯০৯, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, পৃ.৩৭৯।
২৫. সন্দীপকুমার মণ্ডল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী-র খাদ্য: রসনা ও বাসনা, (কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা), সম্পা. বিশ্বনাথ রায়), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.৩০৩।
২৬. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.১০১।
২৭. আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক), অভীক সরকার (সম্পা.), দ্র. রামকুমার মুখোধ্যায়ের আশিস পাঠককে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার পাঠককেও দীক্ষিত হতে হবে, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল, ২০১৩।
২৮. দেশ (মাসিক), (সম্পা. হর্ষ দত্ত), দ্র. হর্ষ দত্ত রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপাখ্যান নয় শীর্ষক প্রবন্ধ, ২ মে, ২০১৩, পৃ.৬৭।
২৯. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.১২৭।
৩০. তদেব, পৃ.১৩৪।
৩১. তদেব, পৃ. ১৩৭।
৩২. তদেব, পৃ. ১৫৯।
৩৩. তদেব, পৃ. ১৬৫।
৩৪. তদেব, পৃ.১৯৭।
৩৫. তদেব, পৃ. ২০৩।

৩৬. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৯।
৩৭. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.২১৫।
৩৮. তদেব, পৃ. ২১৮।
৩৯। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, মঙ্গলকাব্যের পুনর্নবীকরণ ও বাংলা উপন্যাস, (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর), বাকপ্রতিমা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০১২, পৃ.৩১৮।
৪০. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ.২৩০।
৪১. তদেব, পৃ. ২৩১।
৪২. গণশক্তি (দৈনিক), নারায়ণ দত্ত (সম্পা), দ্র, সঞ্চারী সেন রচিত মুশায়রার রং মানবিক শীর্ষক প্রবন্ধ, ১৩ জুন, ২০১৬।
৪৩. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৩৩।
৪৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃতির স্বরূপ, (দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য), (সম্পা.অলোক রায়), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৭,পৃ.১৭৯।